□

৩০.০ উদ্দেশ্য

৩০.১ প্রস্তাবনা

৩০.২ রাজনীতিক পরিবর্তন ও সামাজিক পরিবর্তন

৩০.৩ রাজনীতিক পরিবর্তনের কারণ (উৎস)

৩০.৩.১ রাজনীতিক পরিবর্তনের উৎসগত উপাদানসমূহ

৩০.৪ রাজনীতিক পরিবর্তনের বিভিন্ন ধারা

৩০.৪.১ প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, ষড়যন্ত্র, অভ্যুত্থান

৩০.৪.২ বিপ্লব

৩০.৫ রাজনীতিক পরিবর্তন : মতাদর্শের ভূমিকা

৩০.৬ সারাংশ

৩০.৭ অনুশীলনী

৩০.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৩০.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে জানা যাবে—

- রাজনীতিক পরিবর্তনের সাথে সামাজিক পরিবর্তনের পার্থক্য।
- রাজনীতিক পরিবর্তনের প্রধান উৎসগুলি কী?
- রাজনীতিক পরিবর্তনের বিভিন্ন ধারা।
- রাজনীতিক পরিবর্তন হিসেবে বিপ্লবের প্রকৃতি ও তাৎপর্য।
- রাজনীতিক পরিবর্তনে মতাদর্শের ভূমিকা।

সামাজিক রূপান্তরের মতোই রাজনীতিতেও প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের এক বিরামহীন প্রক্রিয়া বর্তমান। রাজনীতির এই গতিশীল পরিবর্তন-প্রক্রিয়ার মূলে আছে সমাজের পরিবর্তমান আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক

পরিস্থিতি। অন্যভাবে বলা যায়, সমাজের নানা আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত প্রতিক্রিয়া হিসেবেই রাজীনতিতে প্রতিনিয়ত নানা পরিবর্তন বা রূপান্তর ঘটে বা ঘটানো হয়। সমাজের এই পরিবর্তমান আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিস্থিতির অন্তর্ভুক্ত বিষয় বা উপাদানগুলো বহু ও বিচিত্র। যেমন, আর্থনীতিক উৎপাদনধারার পরিবর্তন, প্রযুক্তিগত কলাকৌশলের পরিবর্তন, জনসংখ্যাগত ও অভিবাসনগত (migration) পরিবর্তন, নগরায়ণ জনিত পরিবর্তন, নতুন নতুন সামাজিক শ্রেণীসমূহের উদ্ভবগত পরিবর্তন, শিক্ষাসংস্কৃতি ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ব্যবসা বা নিয়োগগত পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের ভারসাম্যের পরিবর্তন ইত্যাদি। এই সমস্ত নানা পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে রাজনীতিক সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া, রাজনীতির সাংগঠনিক কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানগত বিন্যাস ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াগুলির পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই পরিবর্তনের বা রূপান্তরের রূপ, প্রক্রিয়া ও প্রকরণ, বলা বাহুল্য, সবক্ষেত্রে একরকম নয়। রাজনীতিক পরিবর্তন প্রক্রিয়া কখনো যেমন ক্রমিক সংস্কারপন্থী কখনো তা আবার আমূল সংশোধনপন্থী ও আকস্মিক; কখনো যেমন সীমিত বা খণ্ডিত কখনোবা তা ব্যাপক; কখনো যেমন তা শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক কখনো তা আবার সহিংস ও রক্তক্ষয়ী।

বিপ্লব, বলা বাহুল্য, এক বিশেষ ধরনের সমাজ-রাজনীতিক পরিবর্তন যার প্রক্রিয়া-প্রকরণ অন্যান্য ধারার পরিবর্তন থেকে মূলত এবং স্পষ্টতই স্বতন্ত্র। এই পরিবর্তন আমূলপন্থী ও চরমপন্থী তো বটেই, এবং সেই কারণেই এর ব্যাপ্তি ও গভীরতা সমাজজীবনকে অনেক বেশি মাত্রায় উৎক্ষিপ্ত ও আলোড়িত করে। রাজনীতিক পরিবর্তন হিসেবে বিপ্লবের এই স্বতন্ত্রময় প্রকৃতি ও ভূমিকার জন্য বিপ্লব সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তাত্ত্বিকরা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিপ্লবের প্রকৃতি ও তাৎপর্য পর্যালোচনা করেছেন।

সমাজ ও রাজনীতি পরস্পর-নিরপেক্ষ তো নয়ই, বরং উভয়ে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। এই পারস্পরিক সাপেক্ষতাই রাজনীতিক সমাজতত্ত্ব (Political Sociology)-র কেন্দ্রীয় ধারণা।

সমাজ বলতে সাধারণভাবে বোঝায় কোনও জনগোষ্ঠীর সদস্যদের পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে-ওঠা নিবিড়, বিচিত্র ও জটিল সম্বন্ধজাল। স্বভাবতই এই জটিল সম্বন্ধজাল থেকে জন্ম নেয় কিছু প্রয়োজনীয় কাঠামো বা প্রতিষ্ঠান এবং আনুষঙ্গিক বিধিব্যবস্থা। মানুষের গতিশীল জীবনধারায় এই পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার যেমন পরিবর্তন ঘটে তেমনি পরিবর্তন ঘটে এইসব কাঠামো, প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট বিধিব্যবস্থার। সামগ্রিকভাবে একটি জনগোষ্ঠীর এই সমুদয় রূপান্তরকেই আমরা সামাজিক পরিবর্তন বলে অভিহিত করতে পারি।

সামাজিক পরিবর্তনের স্বরূপকে আর একভাবে কেউ কেউ বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। মানবদেহের অভ্যন্তরে অবিরাম নানা রাসায়নিক রূপান্তর বা metabolism ঘটে, ফলশ্রুতিতে মানুষের আকৃতি-প্রকৃতিতে নানা পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তেমনি সমাজদেহের অভ্যন্তরে যে অবিরাম নানা পরিবর্তন ঘটে চলে তাকে Social metabolism বা সমাজদেহের রাসায়নিক রূপান্তর বলা যেতে পারে।

রাজনীতি হল সমাজের সুসংগঠিত ও বৈধতাপূর্ণ কর্তৃত্বকাঠামো ও তার প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাসের সাথে সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থা। স্বভাবতই সংশ্লিষ্ট সমাজ-অর্থনীতির পটভূমিকে বাদ দিয়ে কোনও রাজনীতি—অর্থাৎ এই বৈধতাপূর্ণ কর্তৃত্ব-কাঠামোর বিন্যাস ও বিধিব্যবস্থাকে ও তার গতিপ্রকৃতিকে যথার্থভাবে অনুধাবন করা যাবে না। অন্যদিক থেকে বলা যায়, রাজনীতি ও রাজনীতিক পরিবর্তন অনিবার্যভাবেই সমাজ-অর্থনীতির সাথে ও তার পরিবর্তন-প্রবাহের সাথে অন্বিত। কিন্তু রাজনীতিক পরিবর্তন দেশের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সাথে যত নিবিড়ভাবেই সম্পর্কিত হোক না কেন রাজনীতিক পরিবর্তন ও সামাজিক পরিবর্তন দু'টি সমার্থক ধারণা নয়। সমগ্র সমাজজীবনকে একটি ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করলে রাজনীতিকে ঐ ব্যবস্থার 'উপব্যবস্থা' (Sub-system) বলে ধরা যেতে পারে।

রাজনীতিক অন্তর্নিহিত সত্তাটি প্রোথিত আছে মানবসমাজের দ্বন্দ্ব সংঘাতময় পটভূমিতে। মানবসমাজের সুদূরতম অতীত থেকে অত্যাধুনিক কাল পর্যন্ত কোনও কালেই এই দ্বন্দ্বময় পটভূমির অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়নি। (মার্ক্স-কথিত আদিম সাম্যবাদী সমাজ সম্পর্কেও বিতর্কের অবকাশ বর্তমান)। আর এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় সামাজিক পটভূমি ও তৎসংশ্লিষ্ট আধিপত্য-অধীনতার প্রশ্নগুলি—যা সমাজে রাজনীতি নামক প্রক্রিয়া-প্রকরণের জন্ম দিয়েছে—এক চিরন্তন প্রবাহ হিসেবে সমাজে টিকে আছে। এই দিক থেকেই রাজনীতিকে সমাজের অন্তর্গত এক বিরামহীন স্রোত হিসেবে গণ্য করা যায়। তার অর্থ অবশ্যই এ নয় যে এই স্রোতের ধারাবদল ঘটেনি। বরং প্রকৃতি সত্যটি হল, এই স্রোতের ধারাবদল ঘটেছে ইতিহাসের নানা পর্যায়ে, নানাভাবে এবং এগুলোই বিভিন্ন মানবসমাজের ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। এককথায় তাই, রাজনীতি আর সমাজের চলমানতা পরস্পরকে নিয়ন্ত্রিত করে। রাজনীতির এই পরিবর্তনশীল ধারা নানা সামাজিক ও আর্থনীতিক উপাদানসমূহের ব্যাপক সমাহারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে স¥প্রবন্ধযুক্ত। ("Political change is intricately related to a wide Spectrum of social & economic factors"—Davies & Lewis : Models of Political Systems) । উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনও সমাজে যখন শিল্পায়ন, নগরায়ণ, শিক্ষার বিস্তার, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ইত্যাদি প্রক্রিয়া ক্রমশ বিস্তৃত হতে থাকে তখন তার প্রতিক্রিয়ায় নতুন মূল্যবোধ, প্রত্যাশা ও নতুন নতুন দাবীদাওয়া জন্ম নেয় আর এইসব প্রত্যাশা ও দাবীদাওয়াগুলির মোকাবিলায় এবং তার সাথে সঙ্গতি বজায় রাখতে দেশে রাজনীতিক ব্যবস্থা তার নিজস্ব কাঠামোগত বিন্যাস ও পদ্ধতি-প্রকরণে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন না করে পারে না। সচরাচর এই পরিবর্তন ক্রমান্বয়িক, ধীরগতিসম্পন্ন ও নিয়মতান্ত্রিক। কিন্তু এ কথা কখনো বলা যাবে না যে, দেশের আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে যেসব নতুন প্রত্যাশা ও দাবীদাওয়া জন্ম নেয় এবং দেশের রাজনীতিতে অভিঘাত সৃষ্টি করে, রাজনীতির প্রক্রিয়ায় তার সমানুপাতিক পরিবর্তনই সূচিত হয়। বরং অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, রাজনীতিক পরিবর্তনের গতিবেগ বা মাত্রা সমাজে গড়ে ওঠা চাহিদা ও দাবীদাওয়ার তুলনায় শ্লথগতি ও সীমিতমাত্রিক। বস্তুত, সামাজিক প্রত্যাশার সাথে তুলনায় রাজনীতি পরিবর্তনের বাস্তব গতির যে অসামঞ্জস্য বা ঘাটতি তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকলে সমাজের পুঞ্জিভূত বিক্ষোভ ইতস্তত বিদ্রোহ-বিস্ফোরণের ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ ঘটায়; আবার কখনোবা তা সুপরিকল্পিত

বিপ্লবের রূপ নেয়। এ কারণে আধুনিক কালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, উন্নত রাজনীতিক ব্যবস্থার অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই হল সমাজের গতিশীল প্রক্রিয়ার মধ্য থেকে গড়ে ওঠা দ্বন্দ্ব-সংঘাত আত্তীকরণ করার ক্ষমতা, এবং এই ক্ষমতাই ঐ ব্যবস্থার স্থায়িত্বের বা ধারাবাহিকতার গ্যারান্টি। একে আমরা বলতে পারি 'পরিবর্তনের মাধ্যমে ধারাবাহিকতা' (Continuity through change)।

৩০.৩.১ রাজনীতিক পরিবর্তনের উৎসগত উপাদানসমূহ

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানবসমাজে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, বর্গ, সম্প্রদায় ইত্যাদির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের উৎসভূমি থেকেই রাজনীতিক প্রক্রিয়া-প্রকরণ ও তার নির্দিষ্ট বিধিব্যবস্থার জন্ম। স্বভাবতই রাজনীতিক পরিবর্তনের মূলেও রয়েছে এই দ্বন্দ্বসঙ্কুল সমাজের গতিশীল প্রক্রিয়া যা অনিবার্যভাবেই রাজনীতিক বিধিব্যবস্থার উপর নানা অভিঘাত সৃষ্টি করে ও রাজনীতির প্রক্রিয়া-প্রকরণের পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে।

সমাজের অন্তর্গত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের দরুনই দেশের রাজনীতিক পরিবর্তনের সূচনা হয়—সাধারণভাবে এ কথা বলা হলেও রাজনীতিক পরিবর্তনের নির্দিষ্ট কারণ হিসেবে কয়েকটি প্রধান উপাদানসূত্রের নির্দেশ করা হয়। Tom Bottomore এইরকম নির্দিষ্ট কয়েকটি উপাদানসূত্রকে গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছেন। গুরুত্বের দিক থেকে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সমাজের অর্থনৈতিক উৎপাদন ধারার রূপান্তরকে। মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, সমাজের অর্থনৈতিক বা বৈষয়িক উৎপাদনধারার রূপান্তর শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট। যে-কোনও শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বৈষয়িক উৎপাদনধারাকে কেন্দ্র করে যে দু'টি মুখ্য শ্রেণী দুই পরস্পর-বিপরীত স্বার্থের সংঘাতে লিপ্ত হয়, তার পরিণতিতে সমাজে ক্ষমতা-কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে যা অবশ্যম্ভাবীভাবেই রাজনীতিক পরিবর্তনের সূচনা করে। মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী, সমাজের বৈষয়িক উৎপাদন ও বণ্টনধারা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর নির্ভর করেই রাজনীতিক উপরি-কাঠামো গড়ে ওঠে এবং এই অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন রাজনীতিক উপরি-কাঠামোর পরিবর্তন রূপান্তরকে নিয়ন্ত্রিত করে। শুধু রাজনীতিক উপরি-কাঠামোই নয়, অন্যান্য উপরি-কাঠামো, যেমন সামাজিক, শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক উপরি-কাঠামোতেও পরিবর্তন সঞ্চারিত হয় এই অর্থনৈতিক কাঠামোর রূপান্তরের দরুনই।

আবার রাজনীতিক পরিবর্তনের মূলে অর্থনৈতিক উপাদানের প্রভাবকে অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনও কোনও সমাজতাত্ত্বিক বিচার করার চেষ্টা করেছেন। অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনকে এখানে কোনও শ্রেণীগত স্বার্থের মধ্যেকার সংঘাতের ফলশ্রুতি হিসেবে দেখা হয় না, দেখা হয় উৎপাদন কর্মে নিযুক্ত প্রযুক্তিগত কলাকৌশলের বিপুল অগ্রগতি এবং উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় তজ্জনিত রূপান্তর হিসেবে। বিশেষত আধুনিক শিল্পসমাজের উদ্ভব ও বিকাশের পটভূমিতে এ কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, অত্যাধুনিক যন্ত্রনির্ভর উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সমাজ-অর্থনীতিতে যে নতুন নতুন শক্তির উদ্ভব হয়, সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের যে নতুন নতুন প্রবাহ-প্লবতা সৃষ্টি হয় এবং সর্বোপরি এসবের চাপে সামাজিক শক্তির যে নতুন গতিশীল ভারসাম্য গড়ে ওঠে তা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার নিরন্তর অভিঘাত সৃষ্টি করে।

আর একদিক থেকেও এই আধুনিক প্রযুক্তি রাজনীতিক বিধিব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। শিল্পবিপ্লব পরবর্তী বিশ্বে এই বিপুল যান্ত্রিক ও প্রযুক্তিগত বিকাশ-বিস্তার শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উৎপাদন ও বণ্টন-বিনিময় ধারায় বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটায়নি, বদলে দিয়েছে মানবিক সম্পর্ক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, ধ্যানধারণা

ইত্যাদি, যার অভিঘাতে পরিবর্তন ঘটছে রাজনীতির প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠান সমূহে। যান্ত্রিক প্রযুক্তির এই অভূতপূর্ব অগ্রগতি সংযোগ-ব্যবস্থাও প্রশাসনিক দক্ষতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলে রাজনীতির গতিপ্রকৃতিকে প্রভাবিত করেছে। আধুনিক প্রযুক্তির এই অভাবনীয় অগ্রগতি (যেমন কৃত্রিম উপগ্রহ যোগাযোগ, ইন্টারনেট-কম্পিউটার যোগাযোগ, আণবিক বোমা ইত্যাদি) শুধুমাত্র জাতীয় রাজনীতিকেই নয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও তার শক্তিসাম্যকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে।

রাজনীতিক পরিবর্তনের আর এক প্রত্যক্ষ উপাদানসূত্র হল যুদ্ধ। কোনও কোনও সমাজতত্ত্ববিদ বিশেষত কোঁত, স্পেন্সার, ওপেনহাইমার মানবসমাজের প্রত্যক্ষ রূপান্তরের মূলে এক প্রভাবশালী উপাদান হিসেবে যুদ্ধের ভূমিকাকে স্বীকার করেছেন। প্রাচীনকাল থেকে যুদ্ধের মাধ্যমে ছোট ছোট গোষ্ঠীসমাজের বিস্তার ঘটেছে; উপজাতীয় জীবন বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় জীবনের অঙ্গীভূত হয়েছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর সমবায়ে গড়ে উঠেছে সুবিশাল সাম্রাজ্য। খণ্ড-ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ বিশালতা দান করে এবং তার সাংগঠনিক ভিত্তির দৃঢ়করণের মাধ্যমে যুদ্ধ মানবসমাজের রাজনীতিক প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠানের রূপান্তর সাধন করেছে। আবার 'স্বাধীনতাযুদ্ধ'-এর মাধ্যমেই স্বতন্ত্র জাতিসত্তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এবং বৃহৎ সাম্রাজ্যের বিনাশ সাধিত হয়েছে। এককথায়, যুদ্ধ যেমন একদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠীকে সমন্বিত করেছে, অন্যদিকে তেমনি সুবৃহৎ সাম্রাজ্যকে খণ্ড-বিচ্ছিন্ন করে জন্ম দিয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ধারার স্বশাসনের। ফলত, রাজনীতিক ও প্রশাসনিক পন্থা-পদ্ধতির নব নব রূপান্তরের মূলে যুদ্ধের প্রভাব অবিসংবাদী।

আবার, কার্ল ম্যানহাইম প্রজন্মগত বিষমতা বা ব্যবধানকে (Generation gap) রাজনীতিক পরিবর্তনের অন্যতম উপাদানসূত্র বলে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত, আধুনিককালে দ্রুত পরিবর্তনশীল মানবসমাজে সমাজের এক নতুন প্রজন্ম পূর্ববর্তী প্রজন্ম থেকে দৃষ্টিভঙ্গী, মূল্যবোধ, রুচি ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে এতটাই বদলে যায় যে নিজেদের প্রত্যাশা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার পূরণে নতুনতর রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়ার দাবী জানাতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বিগত শতকের ৬০-এর দশকে ইউরোপে ছাত্র-যুব আন্দোলন অথবা প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিপ্লব-পরবর্তী নতুন প্রজন্মের গণতন্ত্র ও মুক্ত সমাজের দাবীর কথা উল্লেখ করা যায়। এ প্রসঙ্গে গণপ্রজাতান্ত্রিক চীনে তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারে সমবেত ছাত্রদের আন্দোলনের কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। সাম্প্রতিক কালের নারীবাদী আন্দোলন সমাজ ও রাষ্ট্রকর্তৃত্ব এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা তথা মানবাধিকারের ধারণায় নতুন এক মাত্রা যোগ করেছে। দেশের পূর্বানুসৃত বিধিবিধান-এর ফলে বদলে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

প্রকৃতিগত বিচারে রাজনীতিক পরিবর্তনকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হল স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত বা অনিবার্য পরিবর্তনের ধারা এবং অন্যটি ঈপ্সিত, প্রস্তাবিত ও পরিকল্পিত ধারা। প্রতিনিয়ত আমাদের সমাজজীবনে যে বিচিত্র গতিশীল প্রক্রিয়া—আর্থনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত—দেশের রাজনীতিক বিধিব্যবস্থার উপর অনিবার্যত নানা অভিঘাত সৃষ্টি করে, তার প্রভাবে রাজনীতিতে পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এই কারণে এই পরিবর্তনকে স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত বা কিছু পরিমাণে মানুষের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ পরিবর্তন বলে চিহ্নিত করা যায়। এই জাতীয় পরিবর্তনের ফলে রাজনীতিক প্রক্রিয়া-প্রকরণ-প্রতিষ্ঠানাদির যে রূপান্তর সাধিত হয় তাকে কোনোক্রমেই গুণগত পরিবর্তন বলে গণ্য করা চলে না; বড় জোর তা এক মাত্রাগত পরিবর্তন।

বলা বাহুল্য, বিশ্বের প্রায় সকল রাজনীতিক ব্যবস্থাতেই অল্পবিস্তর এ জাতীয় পরিবর্তন ক্রমাগত সংঘটিত হয়ে চলেছে।

আর দ্বিতীয় প্রকৃতির পরিবর্তন হল মানুষের ইচ্ছাপ্রসূত ও পরিকল্পিত। কোনও রাজনীতিক ব্যবস্থায় উপরোক্ত এই স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার যে স্থিতিশীল ভারসাম্য বজায় থাকে তা সমাজের সকল অংশের ও স্তরের মানুষের কাছে সমানভাবে গ্রহণীয় বা সহনীয় হয় না। ফলে সেইসব মানুষ তাঁদের সচেতন প্রত্যাশায় প্রস্তাব করেন এবং পরিকল্পনা করেন কিছু বড়রকম পরিবর্তনের। বড়রকম পরিবর্তন মানেই যে তা সবসময় রাজনৈতিক ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তনের পক্ষপাতী; তা নয়। কখনও কখনও এই পরিবর্তন-পরিকল্পনা শুধুই পরিমাণগত বা মাত্রাগত, আবার কখনওবা তা রাজনীতিক ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন সূচিত করতে পারে। এই কারণে এই দ্বিতীয় প্রকৃতির পরিবর্তন—যা সচেতনভাবে মানুষের দ্বারা প্রস্তাবিত ও পরিকল্পিত—তা ভিন্ন ভিন্ন ধারায় সংঘটিত হতে পারে। তাই রাজনীতিতে এই প্রস্তাবিত বা পরিকল্পিত পরিবর্তন কখনও যেমন আমূলপন্থী বা বৈপ্লবিক তেমনি কখনও ক্রমিক ও ধীরগতিসম্পন্ন; কখনও পরিবর্তন যেমন আপোষমুখী কখনও তা আবার সংঘাতপূর্ণ; কখনও যেমন রক্তাক্ত তেমনি কখনও রক্তপাতহীন।

৩০.৪.১ প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, অভ্যুত্থান

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানবসমাজের দ্বন্দ্বসংঘাতময় পটভূমি ও তৎসংশ্লিষ্ট আধিপত্য- অধীনতার প্রশ্নগুলির সাথে রাজনীতি ও রাজনীতিক পরিবর্তনের বিষয়টি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট সময়কালে সামাজিক দ্বন্দ্বসংঘাত ও আধিপত্য-অধীনতার সমাধানসূত্র হিসেবে যে রাজনীতিক বিধিব্যবস্থা বা পদ্ধতিপ্রকরণ চালু থাকে তা সমাজের সকল অংশের অস্তিত্ব ও সমৃদ্ধির পক্ষে স্বভাবতই সমান অনুকূল নয়। ফলে এই অসাম্য ও অসাম্যের বোধ থেকেই সঞ্চারিত হয় ক্ষোভ ও প্রতিবাদের। এই ক্ষোভ ও প্রতিবাদ কখনও কখনও বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের চেহারা নেয়। বিচ্ছিন্ন ক্ষোভ ও প্রতিবাদ কিছুটা সংগঠিত আকারে বিদ্রোহের চেহারা নিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর মধ্যে কোনও সুচিন্তিত পরিকল্পনা বা দূরায়ত লক্ষ্য স্থির থাকে না। স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে ও বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদগুলিকে সুসংগঠিত করার মাধ্যমে এবং তাকে সুচিন্তিত ও দূরায়ত লক্ষ্যে পরিচালিত করেই কার্যকারীভাবে দূরপ্রসারী রাজনীতিক পরিবর্তন সাধন সম্ভব। তবে এই সুসংগঠিত ও সুপরিকল্পিত প্রয়াস দুই বিকল্প পথের অনুসারী হতে পারে; একটি অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক পথ এবং অন্যটি সশস্ত্র ও বৈপ্লবিক পথ। তবে সচরাচর এই শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক পথে সংঘটিত রাজনীতিক পরিবর্তনের চরিত্র হয় ধীরগতিসম্পন্ন ও নিতান্তই মাত্রাগত। এর দ্বারা রাজনৈতিক ব্যবস্থার কোনও আমল গুণগত পরিবর্তন ঘটে না। আবার এ কথা মনে করাও সঙ্গত নয় যে, চরম সংঘাতময় ও সশস্ত্র পরিবর্তনের ধারা মাত্রেই বৈপ্লবিক ও আমূল রূপান্তরের সূচক। যেমন, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র বা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সমাজ-অর্থনীতিতে কোনও গুণগত আমূল রূপান্তর সচরাচর ঘটে না। বস্তুত সমাজের গুণগত ও দূরপ্রসারী রূপান্তর সাধিত হয় একমাত্র বিপ্লবের মাধ্যমে। রাজনীতিক বিধিব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানাদির আমূল গুণগত রূপান্তরের ক্ষেত্রে বিপ্লবের অবদান ও ভূমিকা ব্যাপক ও চমকপ্রদ, তাই রাজনীতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিপ্লবের প্রকৃতি ও তাৎপর্য বিশেষ আলোচনা দাবী করে।

বিপ্লব

রাজনীতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও চমকপ্রদ এক প্রক্রিয়া হলেও বিপ্লবকে ঘিরে নানা ধারণাগত বিভ্রান্তি ও তাত্ত্বিক বিতর্ক বর্তমান। বিপ্লবের রূপ ও স্বরূপ বিষয়ে যেমন নানা বিভ্রান্তিকর ধারণা প্রচলিত আছে তেমনি, এই প্রসঙ্গে, বিপ্লবের সঙ্গে হিংসার সম্পর্কটিকে ঘিরে সবচেয়ে বেশি বিতর্ক দানা বাঁধে। অনেকেই ভেবে থাকেন যে, রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের যে-কোনও ষড়যন্ত্রমূলক ও হিংসাত্মক প্রয়াসই হল বিপ্লব। এই অর্থে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য যে-কোনও 'প্রাসাদ ষড়যন্ত্র' বা কোনও সামরিক অভ্যুত্থানও বিপ্লব পদবাচ্য বা বিপ্লবের সমধর্মী। বলা বাহুল্য, এ ধারণা যথার্থ নয়। বিপ্লবের মধ্যে অতি অবশ্যই রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের চেষ্টা থাকে, এবং প্রায়শই তার সাথে থাকে গোপন ষড়যন্ত্রমূলক প্রয়াস ও হিংসাত্মক পদ্ধতি। কিন্তু প্রকৃত অর্থে বিপ্লবের প্রধানতম লক্ষণটি এর মধ্যে অনুপস্থিত। বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজে আধিপত্য-অধীনতার শ্রেণীগত বিন্যাস বদলে যায়। পূর্বেকার আধিপত্যকারী শ্রেণীর বদলে নতুন কোনও শ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। অন্যদিকে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র বা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সমাজ বা রাজনীতিতে শ্রেণীগত ক্ষমতা বণ্টন বিন্যাসের কোনও হেরফের হয় না। ফলত, ঐতিহাসিক দিক থেকে বিপ্লবের মাধ্যমে সূচিত হয় সামাজিক অগ্রগতির এক গুণগত রূপান্তর। সামগ্রিকভাবে সমাজের এই গুণগত অগ্রগতির প্রভাবে ও প্রয়োজনেই রাজনীতিতেও ঘটে এক আমূল রূপান্তর, প্রতিষ্ঠিত হয় এক নতুন শ্রেণীস্বার্থের প্রাধান্য। আর এটাই হল বিপ্লবের মূখ্য চারিত্রলক্ষণ। অতএব যে-কোনও ধরনের গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি, প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র বা সামরিক অভ্যুত্থানকে বিপ্লবের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না; বরং কখনও কখনও বা প্রতি-বিপ্লব বলে চিহ্নিত হয়। অন্যভাবে বলা যায় রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের হিংসাত্মক প্রক্রিয়া মাত্রেই বিপ্লব নয়; বিপ্লব হল আর্থ-সামাজিক বিন্যাস-সংস্থাপনের এক গুণগত রূপান্তর প্রক্রিয়ার সূচক। আর এই প্রক্রিয়ায় ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান এবং জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এক অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে, প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র বা সামরিক অভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে জনগণের ভূমিকা নিতান্তই নিরুপায় দর্শকের।

এই প্রসঙ্গে বিপ্লবের সাথে হিংসার যথার্থ সম্পর্ক নিয়েও নানা বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। আর্থ-সামাজিক বিধিবিন্যাসের এক গুণগত রূপান্তর প্রক্রিয়ার পরিণতিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের যে প্রয়াস বিপ্লবের মাধ্যমে সংঘটিত হয় তা কি অনিবার্যভাবেই হিংসাশ্রয়ী ও রক্তপাতপূর্ণ? অস্বীকার করার উপায় নেই যে বিপ্লব মূলতই ধ্বংসাত্মক ও সহিংস কর্মকাণ্ড যার মাধ্যমে পুরোনো সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (মূলত রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান)-কে ধ্বংস করে নতুন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা হয়। আর এই চেষ্টার বিরুদ্ধে পূর্বেকার আধিপত্যকারী শ্রেণী ও প্রতিষ্ঠানগুলি সহিংস প্রতিরোধ গড়ে তোলে যার বিপ্লবী শ্রেণীগুলির পক্ষেও হিংসাশ্রয়ী পদ্ধতি অবলম্বন অবশ্যম্ভাবী ও জরুরি হয়ে ওঠে। কিন্তু বিপ্লবী শক্তির এই হিংসাশ্রয়ী প্রতিরোধের ধারা ও তার মাত্রা পরিস্থিতি ভেদে ভিন্ন হতে পারে। বিপ্লব-বিরোধী তাত্ত্বিকরা বিপ্লবকে সমাজ পরিবর্তনের এক হিংসাত্মক পদ্ধতি হিসেবে চিহ্নিত করে এই অভিযোগ করেন যে, এই জাতীয় পরিবর্তনের দরুন সমাজে যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি, সম্পত্তির বিনাশ ও হত্যালীলা সংঘটিত হয় তার দ্বারা মানুষের কল্যাণের তুলনায় অকল্যাণই সাধিত হয় বেশি। সামাজিক ক্ষয়ক্ষতির এই উচ্চমূল্যের কারণেই বিপ্লব সমাজ পরিবর্তনের পন্থা হিসেবে অকাম্য ও পরিত্যাক্ত। অন্যদিকে, বিপ্লবের সমর্থকরা মনে করেন যে, বিপ্লবে হিংসা ও হত্যালীলার দায়ভাগ বিপ্লবীদের উপর বর্তায় না; তা বর্তায় পুরোনো ক্ষয়িষ্ণু সমাজের কায়েমিস্বার্থের প্রভুদের উপর, যারা

হিংস্রভাবে সমাজের পরিবর্তন প্রয়াসকে প্রতিহত করতে উদ্যত হয়। ফলত, কায়েমিস্বার্থের এই হিংসাত্মক প্রতিরোধের উপরই বিপ্লবী হিংসার মাত্রা ও ব্যাপকতা নির্ভরশীল।

রাজনীতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিত থেকে মতাদর্শের ভূমিকা স্পষ্টতই দ্বিমুখী। একদিকে যেমন প্রতিষ্ঠিত কোনও রাজনীতিক ব্যবস্থাকে সমর্থন করে তার স্বপক্ষে বৈধতা সৃষ্টি করতে এবং তাকে স্থায়িত্ব দিতে সক্রিয় থাকে, কোনও কোনও মতাদর্শ তেমনি ঐ ব্যবস্থার বিরোধী। মতাদর্শের কাজ হল প্রচলিত ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ অসংগতি, সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতাকে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে ঐ ব্যবস্থার পরিবর্তন, আমূল রূপান্তর বা উচ্ছেদে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা। অর্থাৎ, একদিকে যেমন স্থিতাবস্থা রক্ষাকারী রাজনীতিক মতাদর্শ আছে, অন্যদিকে তেমনি পরিবর্তমকামী রাজনীতিক মতাদর্শের প্রভাবও বাস্তব রাজনৈতিক কর্মধারার উপর কম হল। এককথায়, রাজনীতিক স্থিতাবস্থা বা স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে যেমন রাজনীতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও তেমনি মতাদর্শের ভূমিকা সমান উল্লেখনীয়।

রাজনীতিক পরিবর্তনে মতাদর্শের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সেটি উপলব্ধি করতে হলে প্রথমেই স্মরণে রাখা দরকার যে, রাজনীতিক পরিবর্তনের ধারাকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হল স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত ও অনিবার্য ধারা যা মানুষের সচেতন ইচ্ছাপ্রসূত বা পরিকল্পিত নয়। সমাজের গতিশীল জীবনধারার নানা অভিঘাতে রাজনীতিক বিধিব্যবস্থায় বাধ্যত কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। এর সাথে রাজনীতিক মতাদর্শের তেমন কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু মানুষের সচেতন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা অনুযায়ী যেসব রাজনীতিক পরিবর্তন সাধিত হয় বা সাধনের প্রয়াস চলে তা সাধারণত কোনও-না-কোনও মতাদর্শের সাথে সম্পর্কিত। রাজনীতিক মতাদর্শই কোনও প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত অসংগতি অযৌক্তিকতা ও অমানবিকতা, এমনকি সমগ্র সমাজব্যবস্থাটির অনুপযোগিতা বা অপ্রাসঙ্গিকতাকে উন্মোচিত করার মাধ্যমে তার ক্রমিক সংখ্যার অথবা সামগ্রিক বিলোপ ও রূপান্তর দাবী করতে পারে। রাজনীতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিত থেকে তাই মতাদর্শকে স্পষ্টতই দু'ভাগে ভাগ করা যায়—ক্রমিক, সংস্কারধর্মী পরিবর্তনের সমর্থক মতাদর্শ এবং আমূল বৈপ্লবিক রূপান্তরের পক্ষপাতী মতাদর্শ। তবে, আপাতভাবে এ জাতীয় ভাগ সঠিক মনে হলেও গভীরতর বিশ্লেষণে মতাদর্শের এরকম বিভাজন হয়তো খুব যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, প্রচলিত সমাজ-রাজনীতিক ব্যবস্থার প্রেক্ষিত থেকেই মতাদর্শের এই সংস্কারবাদী ও বৈপ্লবিক চরিত্রের পার্থক্য নির্ণয় করা উচিত। যেমন, উদারনীতিবাদ যেহেতু বিদ্যমান কোনও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমর্থক তাই উদারনীতিবাদ এই ব্যবস্থার স্থায়িত্বের পাশাপাশি এর প্রয়োজনীয় সংস্কারসাধন ও শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের বিরোধিতা করে না। অন্যদিকে, মার্ক্সবাদ যেহেতু শ্রেণীশোষণভিত্তিক বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিপক্ষে তাই তার রূপান্তর সাধনে বৈপ্লবিক পন্থার পক্ষপাতী হলেও প্রতিষ্ঠিত কোনও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনে বৈপ্লবিক পন্থার পক্ষপাতী নয়। তাই বলা যেতে পারে যে, কোনও প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার পক্ষে যে মতাদর্শ তা সর্বদাই সংস্কারপন্থী, বৈপ্লবিক নয়।

(১) মানুষের গতিশীল জীবনধারায় সামাজিক পরিবর্তনের মতো রাজনীতিক পরিবর্তনও এক অনিবার্য ও বিরামহীন প্রক্রিয়া। কিন্তু সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনীতিক পরিবর্তন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হলেও এ দু'টি ভিন্ন পর্যায়ভুক্ত প্রক্রিয়া। সামগ্রিকভাবে সমাজে মানুষের জীবনধারায় যত প্রকার পরিবর্তন ঘটে তা সবই সামাজিক পরিবর্তন হিসেবে অভিহিত হতে পারে। এই অর্থে রাজনীতিক পরিবর্তনও সামাজিক পরিবর্তনের অঙ্গ। কিন্তু সমস্ত সামাজিক পরিবর্তন রাজনীতিক পরিবর্তন নয়, বলাই বাহুল্য।

(২) রাজনীতিক পরিবর্তনের কারণ নিহিত আছে সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পটভূমিতে। প্রত্যেক সমাজেই আধিপত্য-অধীনতার এক কাঠামোগত বিন্যাস প্রতিষ্ঠিত থাকে। সমাজের বহুবিচিত্র দ্বন্দ্বসংঘাতের চাপে আধিপত্য-অধীনতার এই কাঠামোগত বিন্যাস ও তার প্রাতিষ্ঠানিক রূপরীতিতে যে বদল ঘটে তাকেই রাজনীতিক পরিবর্তন বলে অভিহিত করা চলে। মানুষের সামাজিক জীবনধারায় যে আর্থিক, প্রযুক্তিগত, বা শিক্ষা-সংস্কৃতিগত নানা পরিবর্তন ঘটে চলে তার প্রভাবে রাজনীতিক বিধিব্যবস্থাতেও পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। তবে সমাজের জীবনধারাগত পরিবর্তনের সমানুপাতিক হারে বা গতিবেগে যে রাজনীতিক পরিবর্তন ঘটে তা বলা যায় না।

(৩) রাজনীতিক পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য সুনির্দিষ্ট উপাদানগুলির মধ্যে চারটি উপাদানসূত্রের উল্লেখ করেছেন রাজনীতিক সমাজতত্ত্বের পণ্ডিতরা। গুরুত্বের বিচারে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় অর্থনীতিতে শ্রেণী-সংঘাতগত উপাদান। এর পরেই উল্লেখ করতে হয় উৎপাদন ধারায় নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ ও প্রসারগত উপাদান যা শুধু সামাজিক উৎপাদন ও বিনিময় ধারাতেই নয়, সমাজের মানবিক সম্পর্ক, দৃষ্টিভঙ্গী, মূল্যবোধ ইত্যাদিকেও প্রভাবিত করে রাজনীতিক বিধিব্যবস্থার উপর নানা অভিঘাত সৃষ্টি করে। তৃতীয় উল্লেখযোগ্য উপাদান হল যুদ্ধ, যার মাধ্যমে প্রচলিত রাজনীতিক বিধিব্যবস্থা প্রত্যক্ষভাবে পরিবর্তিত হয়। সবশেষে উল্লেখ করতে হয় প্রজন্মগত ব্যবধানের উপাদানটির কথা। এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী, মূল্যবোধ, রুচি ও প্রত্যাশায় যে পরিবর্তন ঘটে তার চাপেও রাজনীতিক কাঠামো ও তার প্রতিষ্ঠানসমূহ বদলাতে পারে।

(৪) রাজনীতিক পরিবর্তন বিভিন্ন ধারায় সংঘটিত হয়। প্রধান দু'টি ধারার একটি হল স্বতঃস্ফূর্ত, অনিবার্য বা অপরিকল্পিত ধারা এবং অন্যটি প্রস্তাবিত বা পরিকল্পিত ধারা। আবার এই পরিকল্পিত ধারার পরিবর্তনকেও দু'টি ধারায় ভাগ করা যায়—একটি নিয়মতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ আইনানুগ ধারা এবং অন্যটি চরমপন্থী বৈপ্লবিক ধারা। প্রচলিত রাজনীতিক ব্যবস্থার বিপক্ষে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ বা বিদ্রোহ বিক্ষিপ্ত বা অসংলগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করে বটে, কিন্তু সুচিন্তিত ও পরিকল্পিত পথে তাকে কাজে লাগিয়ে সংগঠিত হয় বিপ্লব।

(৫) রাজনীতিক পরিবর্তনে মতাদর্শের ভূমিকা বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মূল্যবান আলোচনা করেছেন। রাজনীতির স্বতঃস্ফূর্ত ও অনিবার্য পরিবর্তনের যে বিরামহীন ধারা তার সাথে মতাদর্শের তেমন সম্পর্ক নেই বললেই চলে। কিন্তু রাজনীতিক বিধিব্যবস্থায় মানুষের সচেতন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা অনুযায়ী যে পরিবর্তন সংগঠিত হয় তা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কোনও-না-কোনও মতাদর্শের অনুসারী। এক্ষেত্রে মতাদর্শের ভূমিকা দ্বিবিধ। মতাদর্শ একদিকে যেমন প্রচলিত কোনও রাজনীতিক ব্যবস্থাকে বৈধতা দান করে তার স্থিতিশীলতা

বজায় রাখতে সাহায্য করে তেমনি আবার অন্যদিকে বিপরীতধর্মী কোনও মতাদর্শ ঐ ব্যবস্থার অপ্রসাঙ্গিকতা ও অযথার্থতাকে উন্মোচিত করে তার পরিবর্তন বা বিলুপ্তিকে ত্বরান্বিত করতে সচেষ্ট হয়।

নিম্নোক্ত বিবৃতিগুলি ঠিক না ভুল তা (✓) দিয়ে চিহ্নিত করুন।

	ঠিক	ভুল
১। সামাজিক পরিবর্তন মাত্রেই রাজনৈতিক পরিবর্তন—	☐	☐
২। রাজনীতিক পরিবর্তন মাত্রেই সামাজিক পরিবর্তন—	☐	☐
৩। আর্থ-সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের দরুন রাজনীতিক পরিবর্তন সাধিত হয়—	☐	☐
৪। সমাজের উৎপাদনধারা ও জীবনধারায় প্রযুক্তিগত বিকাশ-বিস্তারের দরুন রাজনীতিক পরিবর্তন সাধিত হয়—	☐	☐
৫। রাজনীতিক পরিবর্তনের ধারা সর্বদাই পরিকল্পিত—	☐	☐
৬। রাজনীতিক পরিবর্তনের এক স্বতঃস্ফূর্ত ও আকস্মিক প্রক্রিয়া হল বিপ্লব—	☐	☐
৭। রাজনীতিক মতাদর্শ ছাড়া কোনো রাজনীতিক পরিবর্তন সম্ভব নয়—	☐	☐

নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন।

১। রাজনীতিক পরিবর্তন বলতে কী বোঝায়?

২। সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনীতিক পরিবর্তনের পার্থক্য কী?

৩। রাজনীতিক পরিবর্তনের উৎসভূমি কী?

৪। রাজনীতিক পরিবর্তনের অর্থনৈতিক উপাদান বিষয়ে আলোচনা করুন।

৫। যুদ্ধ কীভাবে রাজনীতিক পরিবর্তন সাধন করে আলোচনা করুন।

৬। বিপ্লবের সঙ্গে সামরিক অভ্যুত্থানের পার্থক্য নিরূপণ করুন।

৭। মতাদর্শের সাথে রাজনীতির স্থিতাবস্থা ও রাজনীতিক পরিবর্তনের সম্পর্ক নিরূপণ করুন।

১। G. A. Almond & G. B. Powell : Comparative Politics

২। T. Bottomore : Political Sociology

৩। Samuel Huntington : Political Order in a Changing Society

৪। Ali Ashraf & L. N. Sharma : Political Sociology